المنهجية في طلب العلم

« باللغة البنغالية »

الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ

ترجمة: محمد نور الله تعريف

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1435

IslamHouse.com

ইলমে দ্বীন অর্জনের পথ ও পদ্ধতি

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সঙ্গিসাথীদের প্রতি। হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন আমাদেরকে তাদের অর্ন্তভুক্ত করে নিন। আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন। যাদেরকে আপনার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন আমাদেরকে তাদের তালিকাভুক্ত করে নিন। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করে দিন। আমাদের আমলসমূহকে উত্তম করে দিন। আমাদেরকে সঠিক কথা বলার তাওফিক দিন। আপনি যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন তা আমাদেরকে পালন করার তাওফিক দিন। আমাদেরকে আপনার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী বানিয়ে দিন।

আজ রাত্রে আমরা ইল্ম অর্জনের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপক্রমনিকা পেশ করব। এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমরা তরুণসমাজের মধ্যে ইল্ম অর্জনের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করছি। আল্লাহ তাদেরকে মোবারকময় করুন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না তারা কোন্ পথে অগ্রসর হবে, কিভাবে ইল্ম অর্জন করবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইল্ম অর্জনের পথে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। এমনকি বছরের পর বছর ব্যয় করে। পরিশেষে দেখে যে, একই সময় ব্যয় করে অন্যেরা যতটুকু ইল্ম

অর্জন করতে পেরেছে সে ততটুকু পারেনি। এর কারণ হচ্ছে- সেই ছাত্র ইল্‌ম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেনি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে। আল্লাহ তার তাকদীরে যতটুকু ইল্‌ম অর্জন লিখে রেখেছেন ততটুকু হাছিল করতে পারবে। যার মাধ্যমে সে নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে তার ইলম হবে মজবুত ভিত্তিনির্ভর। যার ভিত্তিতে সে অন্যকে শিক্ষা দিতে পারবে। যে ইল্‌মের মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের রেশ থাকবে না।

অনেক তরুণ আছে- যারা কিছুক্ষণ হাদিস, কিছুক্ষণ তাফসির, কিছুক্ষণ ফিকহ এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে পড়াশুনা করে। তারা ইল্‌মের আসরগুলোতে নিয়মিত হাযির হয়। একবছর বা দুইবছর একজন শাইখের ক্লাশ করার পর যখন নিজেকে পর্যালোচনা করে তখন দেখতে পায়- এতদিন যে বিষয়ের ক্লাশে সে হাযির হয়েছে আসলে ঐ বিষয়টি সে বুঝে না। অথবা যতটুকু সে অর্জন করেছে তা যৎসামান্য। অথবা তার অর্জিত ইল্‌মের ভিত্তিমূল খুব দুর্বল। এর উপর নির্ভর করে তার পক্ষে নতুন কিছু বুঝা বা গবেষণা করা সম্ভবপর নয়। কারণ কী! কারণ হলো- ইল্‌ম অর্জনের সঠিক ক্রমধারা অনুসরণ না-করা। তালিবে ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জনকারীকে ইল্‌ম হাছিলের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ক্রমধারা অনুসরণ করতে হবে। সঠিক ক্রমধারা অনুসরণ না করলে সে ইল্‌মের পথ থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। এ কারণে আমরা অনেক তালিবে ইল্‌মকে ইল্‌ম

অর্জনের পথ ছেড়ে দিতে দেখি। কয়েক বছর হয়তো ইল্‌ম অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষমেষ বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। মাস চলে যায়, বছর চলে যায় কিন্তু তারা সাধারণ মানুষই থেকে যায় অথবা পাঠক হিসেবেই থেকে যায়, এর গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না। যে ছাত্র ইল্‌মের পথে অগ্রসর হতে চায় আমরা কামনা করি তার মধ্যে দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকবে:

এক: আমাদের পূর্বসুরিগণ যে ক্রমধারা অবলম্বন করে ইল্‌ম অর্জন করে আলেম হয়েছেন সেই ক্রমধারা বজায় রেখে ইল্‌ম অর্জন করবে।

দুই: নিজের সময়, শ্রম সবকিছু ইল্‌মের জন্য বিলিয়ে দিবে; কোনোক্রমেই হতোদ্দম হবে না।

খতিব আল-বাগদাদী তাঁর আল-জামে‘ লি আখলাকির রা-ওয়ী ও আ-দা-বিস্ সা-মি‘ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ছাত্র হাদিস অর্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে এ পথে আসেন। ব্যক্তিগতভাবে হাদিসের উস্তাদদের নিকট গিয়ে ও সামষ্টিক আসরগুলোতে উপস্থিত হয়ে হাদিস অর্জনে নিমগ্ন হন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেখলেন যে, তিনি বেশী কিছু শিখতে পারেননি। তার অর্জিত ইলম যৎসামান্য। তখন তিনি এই ভাবনা থেকে ইল্‌ম অর্জন ছেড়ে দিলেন যে- এই ইল্‌ম অর্জন তার জন্য নয়, তার বোধশক্তিতে দুর্বলতা আছে। অথবা তিনি এই ইল্‌মের উপযুক্ত নন। ইল্‌ম অর্জন ছেড়ে দেওয়ার বেশ কিছুদিন পর একবার তিনি একটি বড় পাথরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি

খেয়াল করলেন যে, ফোঁটা ফোঁটা পানি এ পাথরের উপর পড়ে পাথরের গায়ে গর্তের সৃষ্টি করেছে। এ দৃশ্যটি তার চিন্তার জগতে রেখাপাত করে। তিনি ভাবতে লাগলেন: পানি এত দুর্বল হওয়ার পরেও এ কঠিন পাথরকে গর্ত করে ফেলেছে। আমার বিবেকবুদ্ধি বা অন্তর এই পাথরের চেয়ে তো কঠিন নয়। আর ইল্‌ম তো এই পানির চেয়ে দুর্বল নয়। এই ঘটনার পর তিনি পুনরায় ইল্‌মের পথে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ফিরে এসে সত্যি সত্যি তিনি ইল্‌মে দ্বীনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং খ্যাতিমান আলেম হন।

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইল্‌ম অর্জনের জন্য ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। হতোদ্দম হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এই কথা বললে চলবে না - আমি পড়েছি; বুঝি নাই। বরঞ্চ কারণ খুঁজে বের করতে হবে। অধিকাংশ তরুণের ক্ষেত্রে কারণ এটা নয় যে- তারা বুঝে না। তাদের অনেকে ভাল সমঝদার। কিন্তু তারা ইল্‌ম অর্জনের সঠিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করেনি। যে শিক্ষাক্রম আমাদের পূর্বসুরি আলেমগণ অনুসরণ করেছেন। পূর্ববর্তী আলেমগণের অনুসৃত শিক্ষাক্রম হচ্ছে- সহজ। বরং বর্তমানে যারা নানা পথ ও পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছেন সেসব হতে সহজতর।

আমরা যখন এইটুকু বুঝলাম তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে- এটি অনেক তরুণেরই প্রশ্ন - ইল্‌ম অর্জনের সঠিক ক্রমধারা কোনটি? কিভাবে তালিবে ইল্‌ম সঠিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে পারবে? যে শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে আল্লাহ চাহেত সে আলেম হতে পারবে।

এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইল্‌মের আসরগুলোতে হাযির হওয়ার উপকার অনেক; সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে- ইল্‌মের আসরে যা পড়ানো হয়েছে তা নিজে বুঝতে পারা এবং অন্যকে বুঝানোর যোগ্যতা হাছিল করা।

প্রথমত: ইল্‌ম হাছিল করতে হলে তালিবে ইল্‌মের মধ্যে প্রয়োজনীয় আদব আখলাক থাকতে হবে:

এক: ইল্‌ম অর্জন করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; যেহেতু ইল্‌মে দ্বীন অর্জন একটি ইবাদত। তালিবে ইল্‌মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেয় মর্মে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহর দরবারে এই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তাকে এই ইবাদত করার তাওফিক দেয়ার জন্য তালিবে ইল্‌মকে আল্লাহর প্রতি মুখলিস (একনিষ্ঠ) হতে হবে। কোন দুনিয়াবী পদ বা পদবী পাওয়ার নিয়তে ইল্‌ম অর্জন করা যাবে না। অর্থাৎ ইলমে শরয়ী তথা কুরআন ও হাদিসের ইল্‌ম সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন, শিক্ষক হওয়া, প্রভাষক হওয়া, জনগণের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া বা আলোচনা পেশ করার সুযোগ পাওয়ার নিমিত্তে অর্জন করা যাবে না। বরং তালিবে ইল্‌মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর ইবাদত করা, নিজের অজ্ঞতা দূর করা এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর ইবাদত করতে সমর্থ হওয়া।

তাহলে বুঝা গেল যে, ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার অর্থ হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা; দুনিয়াবী কোনো কিছু প্রত্যাশা না করা। তার নিয়ত হবে- নিজের অজ্ঞতা দূর করা। ইমাম

আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো: ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে ইখলাস বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন: ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে ইখলাস হলো- নিজের অজ্ঞতা দূর করার নিয়ত করা। যেহেতু একজন আলেম আর একজন সাধারণ মানুষ সমমর্যাদার অধিকারী নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَآئِمٗا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ﴾ [الزمر: ٩]

“যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আখেরাতের আশংকা রাখে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না উভয় কি সমান হতে পারে?” [সূরা যুমার, আয়াত:৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ﴾ [المجادلة: ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন”। [সূরা মুজাদালাহ্, আয়াত :১০] আয়াত থেকে বুঝা গেল- আল্লাহ তা‘আলা আহলে ইলমকে (ইল্‌মধারীকে) সাধারণ বান্দাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। যে ব্যক্তি ইল্‌মের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করার নিয়ত করে, নিজেকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বাঁচাতে চায় এবং বাস্তব জীবনে শরিয়তের অনুসারী হওয়ার নিয়ত করে সে ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে ইখলাস হাছিল করেছে। যেহেতু সে এই ইল্‌মের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রত্যাশা

করেছে এবং নিজের প্রবৃত্তি-খেয়ালখুশির অন্ধ-অনুসরণ ও মূর্খতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর ইচ্ছা করেছে।

বস্তুত ইখলাস হচ্ছে- তালিবে ইল্‌মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তালিবে ইল্‌মের আরো অনেক গুণাবলী রয়েছে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়েছে। এর কোনটির কলেবর ছোট, কোনটির কলেবর বড়। তবে এখানে স্থান অনুযায়ী এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমরা উল্লেখ করব।

দুই: ইল্‌ম অর্জনে নিজেকে কোমল হতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাধারণভাবে বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ব ক্ষেত্রে কোমলতা পছন্দ করেন।" এই হাদিসটির বিধান সাধারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: "যা কিছুতে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে।" ইলমে দ্বীন ও তা হাসিলেও এ কোমলতা অবলম্বন একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

ইল্‌ম অর্জনে কিভাবে কোমলতা অবলম্বন করা যাবে- সেটাই প্রশ্ন। অর্থাৎ সব ইল্‌ম একসাথে হাসিলে নিমগ্ন হওয়া যাবে না। ঠিক যেমনটি বলেছেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী রাহেমাহুল্লাহ। তিনি বলেন: "যে তালিবে ইল্‌ম সব ইল্‌ম একত্রে অর্জনের ইচ্ছা করে তার সব ইল্‌ম একসাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বরং ইল্‌ম অর্জন করতে হবে রাতদিন ব্যয় করে ধীরে ধীরে।" জনৈক কবি এই অর্থ বুঝাতে গিয়ে বলেছেন

اَلْيَوْمَ عِلْمٌ وَغَدًا مِثْلُـــهُ مِنْ نُخَبِ الْعِلْمِ الَّتِيْ تُلْتَقَطُ
يَحْصُلُ الْمَرْءُ بِهَا حِكْمَةً وَإِنَّمَا السَّيْلُ اِجْتِمَاعُ النُّقَطِ

আজ কিছু ইল্ম, কালকে আরো কিছু; এভাবেই কুড়াতে হয় পছন্দনীয় ইল্মগুলো
ক্রমধারায় অর্জিত হলে তা হয় প্রজ্ঞাময়; জেনে রাখ, ফোটা ফোটা জল জমাট হয়েই তৈরী হয় বন্যা।

এজন্য কোমলতা একান্ত কাম্য। কিভাবে কোমলতা অবলম্বন করা হবে? অর্থাৎ সব ইল্ম একবারে পেয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী হলে চলবে না। যেমন ধরুন একজন ছাত্র তাফসিরবিদ্যা হাছিল করতে চাচ্ছেন। তিনি তাফসিরে তাবারী দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাফসিরে তাবারী হচ্ছে- বহুমুখী তাফসিরের সুতিকাগার। এই ছাত্রের ক্ষেত্রে বলা হবে- তিনি তাফসিরের সব ইল্ম একবারে অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। এই ছাত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাফসিরে তাবারী পড়া শেষ করবে বটে, তবে তার তাফসিরের ইল্ম হাছিল হবে না। আপনি যদি তাকে কোন একটি আয়াতের তাফসির জিজ্ঞেস করেন দেখবেন সে ছাত্র খুব বেশী কিছু মনে করতে পারছে না। তার কাছে শুধু ধাঁধা লাগবে। মনে হবে সে এমন এমন পড়েছেন। কিন্তু সে পরিস্কারভাবে একটি আয়াতের তাফসিরও পেশ করতে পারবে না। তাহলে কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে? ক্রমধারা অবলম্বন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। ক্রমধারা হচ্ছে- পূর্ববর্তী আলেমগণের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি হাদিসের ইল্ম অর্জন করতে চাচ্ছেন। তিনি গিয়ে নাইলুল আওতার থেকে পড়া শুরু করলেন। অথবা ফাতহুল বারী পড়া শুরু করলেন। তিনি বলে বেড়ান: আমি ফাতহুল বারীর অমুক খণ্ড শেষ করেছি। জেনে রাখুন, এই ব্যক্তি ইল্ম হাছিল করতে পারবে না। যে ইল্ম আলেমগণ হাছিল করেছেন। ইনি সর্বোচ্চ ইসলামী সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী (সাংস্কৃতিবান!) হতে পারবেন; যার কাছে বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য থাকবে। কিন্তু এটি ইল্ম নয়; যে ইল্ম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ইল্ম অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তাওফিক দিলে আলেমে দ্বীন হওয়া যাবে।

অনুরূপভাবে এমন ছাত্র পাওয়া যায় তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি ফিকহ শাস্ত্রের ওপর কি কি গ্রন্থ পড়েছেন। তিনি উত্তর দেন আমি ইবনে কুদামার মুগনী পড়ি; আমি ইমাম নববীর মাজমু পড়ি। এ ছাত্র ইল্ম হাছিলের ক্ষেত্রে কোমলতা অবলম্বনকারী নয়। বরং সে সব ইল্ম একবারে হাছিল করতে চেয়েছে। মুগনী, মাজমু, ইত্যাদি বড় বড় গ্রন্থগুলোর আলোচনা হজম করতে পারবেন বড় বড় আলেমগণ। প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবে ইল্মের এসব গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা পড়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ কোনো মাসআলা অনুসন্ধানের জন্য তালিবে ইল্ম এ ধরনের বড় বড় গ্রন্থের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানা পড়বে না।

কোমলতা প্রসঙ্গে আমরা আরো বলতে চাই- তালিবে ইল্‌ম কোনো বিষয়ের বিস্তারিত, খুঁটিনাটি আলোচনার উপর গুরুত্ব দিবে না। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবে ইল্‌ম যদি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম মাসআলা ও বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে মূল মাসআলাটাই ভুলে যাবে। এভাবে সে ইল্‌ম হাছিল করতে পারবে না। কারণ যে মূলনীতিগুলো জানলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলো বুঝা যাবে সে তো সেসব মূলনীতি জানে না। আমাদের আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের আসরগুলোতে অতি বিস্তারিত আলোচনায় অনুপ্রবেশ করেন। একটি মতন বা পাঠ্যপুস্তিকার ব্যাখ্যায় তাঁরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন অথবা একটি পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যায় তাঁরা কয়েক মাস কাটিয়ে দেন। তাঁদের ধারনায় এভাবে ইল্‌ম হাছিল হবে। আসলে তা ঠিক নয়; এটি ধারাবাহিক পদ্ধতি নয়। কারণ এই আলেম তাঁর ক্লাশ উপস্থাপনায় কোমলতা অবলম্বন করেন নি। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ٧٩﴾

[ال عمران: ٧٩]

অর্থ: “কিন্তু তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ও নিজেরা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রব্বানী হও।” [সূরা আলে-ইমরান:৭৯]

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ হাদিসের গ্রন্থে “তোমরা রব্বানী হও” এর ব্যাখ্যায় বলেন: “রব্বানী হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষকে বড় বড় ইল্‌ম শিক্ষাদানের পূর্বে ছোট ছোট ইল্‌ম শিক্ষা দেন।” অর্থাৎ ইল্‌ম অর্জন

ও বিতরণের ক্ষেত্রে রব্বানী হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষকে বড় বড় ইল্‌মের পূর্বে ছোট ছোট ইল্‌ম শিক্ষা দেন।

হ্যাঁ, ছাত্র ও শিক্ষকের জন্য এটা সম্মানজনক যে, কোনো একটি মাসআলা নিয়ে উনি যা কিছু পড়েছেন সবকিছু উল্লেখ করতে পারা। পাঠদানের প্রস্তুতিকালে তিনি যা কিছু পড়েছেন বা জেনেছেন সবকিছু পাঠদানের সময় উল্লেখ করতে পারা সম্মানের বিষয় বটে; কিন্তু এটি ছাত্রের জন্য কল্যাণকর নয়। কারণ তিনি যা কিছু জানেন সবকিছু ঢেলে দিয়েছেন। অথচ আলেমের উচিত হচ্ছে ছাত্রের প্রয়োজন অনুপাতে তাকে জ্ঞান দেওয়া। ছাত্রের ধারণক্ষমতার উর্ধ্বে জ্ঞান না-দেওয়া। অতএব ইল্‌ম অর্জনে কোমলতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হতে হবে। কিভাবে কোমলতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হবে? ইল্‌ম হাছিলের সঠিক ক্রমধারা অবলম্বনের আলোচনায় এর জবাব আসবে।

তিন: ইল্‌ম অর্জনে নিয়মানুবর্তী হতে হবে। তালিবে ইল্‌ম তার সবচেয়ে উত্তম সময় ইল্‌ম অর্জনে ব্যয় করবে। মরা সময় ইল্‌ম অর্জনের জন্য নির্ধারণ করবে না। যে সময়ে মস্তিষ্ক নিস্তেজ থাকে, বোধশক্তি দুর্বল থাকে সে সময় ইল্‌ম অর্জনের জন্য উপযুক্ত নয়। এই সময়কে ইল্‌ম অর্জনের জন্য নির্ধারণ মানে নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করা। অতএব ইল্‌মের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় ব্যয় করতে হবে। যে সময় মস্তিষ্ক সতেজ থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে, ঝঞ্ঝাট মুক্ত থাকে। এটি তখনই সম্ভব হয়, যখন তালিবে ইল্‌ম ইল্‌ম অর্জনের প্রতি তীব্র আগ্রহী হয়। সকালসন্ধ্যা তার মস্তিষ্ক শুধু ইল্‌ম

নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তার লক্ষ্য শুধু ইল্‌ম। ঘুমাতে গেলে তার পাশে কিতাব থাকে। হয়তবা ঘুম আসার আগে কোনো মাসআলা জানার জন্য কিতাবের প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য জনৈক আলেম বলেন: যদি তুমি দেখতে পাও তালিবে ইল্‌মের বইপুস্তক সাজানো গুছানো তাহলে জেনে রাখ সে কিতাব পুস্তক অধ্যয়ন করে না। তুমি যদি আকস্মিকভাবে কারো পাঠাগারে ঢুকে পড় আর দেখতে পাও তার কিতাবপুস্তক সাজানো গুছানো, কিতাবগুলো স্ব স্ব স্থানে শোভা পাচ্ছে এর মানে হলো- তিনি অধ্যয়ন করেন না। মেজেতে কোন কিতাব পড়ে নেই, তার পাশেও কোনো কিতাব নেই, টেবিলের উপরও কোনো কিতাব নেই। এর মানে হচ্ছে- সে কর্মব্যস্ত কিছু সংস্কৃতিমনা মানুষের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কিছু সময়কে তাদের পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন। তালিবে ইল্‌মের নিকট পড়ার সময় বলে কিছু নেই। তালিবে ইল্‌মের সবটুকু সময় ইল্‌ম হাছিলের জন্য। সকাল-সন্ধ্যা সারাক্ষণ তার মনমস্তিষ্ক ইল্‌ম নিয়ে মশগুল। তার জীবনের প্রধান সময় যৌবনকাল। এই সময়ে তিনি ইল্‌মের প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত থাকেন। তিনি তার সময়গুলোকে ইল্‌মের জন্য ভাগ করে নেন। দিনের সবচেয়ে উত্তম সময়, যে সময় মস্তিষ্ক সবল থাকে সে সময়ে তিনি ফিকহ (ইসলামি আইন) ও উসুলুল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি) ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন। কারণ এ জাতীয় বিষয়গুলো বুঝতে মস্তিষ্কের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। মধ্যম মানের সময়ে তিনি তাফসির, হাদিস, হাদিসের পরিভাষা ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন। যে বিষয়গুলো বুঝতে মস্তিষ্কের উপর অতবেশী চাপ পড়ে

না। আর যে সময়ে মস্তিষ্ক দুর্বল থাকে সে সময়ে তিনি সাহিত্য, জীবনচরিত, ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞানের বইগুলো অধ্যয়ন করেন। অর্থাৎ তালিবে ইল্‌ম সারাক্ষণ ইল্‌ম নিয়ে ব্যস্ত। যেখানেই থাকুক না কেন তার কর্মব্যস্ততা হলো ইল্‌ম নিয়ে। কোন বিনোদন বা খোশ আলাপ তাকে ইল্‌ম অর্জন থেকে বিরত রাখে না। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, আজকাল যাদেরকে তালিবে ইল্‌ম বলা হয় তাদের সবচেয়ে বড় দোষ হলো- তারা ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটায় অনর্থক কথাবার্তায়, গালগপ্পে। যেগুলোর সাথে ইল্‌মের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। এই যার অবস্থা সে তালিবে ইল্‌ম নয়; বরং অন্যকিছু। যে কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত সেটাই তার পরিচয় হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তালিবে ইল্‌ম তার আত্মপ্রশান্তি, তার শখ, তার আকাঙ্ক্ষা সবকিছু হচ্ছে ইল্‌মকে নিয়ে। যে মজলিসে ইল্‌ম নিয়ে আলোচনা হয় অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কালাম নিয়ে আলোচনা হয় অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী নিয়ে আলোচনা হয় সে মজলিসে গেলে তালিবে ইল্‌মের আত্মা সুপ্রসন্ন হয়, মনে তৃপ্তি আসে। সুতরাং তালিবে ইল্‌মের বৈশিষ্ট হবে- নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়। তালিবে ইল্‌ম ইল্‌ম হাছিলের জন্য তার যৌবনকালের কিছু সময় নয়; সবটুকু সময় ব্যয় করবে অথবা অধিকাংশ সময় ব্যয় করবে। যেহেতু যৌবনকাল ইল্‌ম হাছিলের উপযুক্ত সময়। এ কারণে পূর্ববর্তী কোনো এক আলেম বলেছেন: "তোমার সবটুকু তুমি ইল্‌মকে দান করো; তাহলে ইল্‌ম তোমাকে সামান্য কিছু দান করবে।" কারণ ইল্‌ম অনেক বিস্তৃত, অনেক প্রশস্ত। তাইতো জনৈক মুহাদ্দিস মৃত্যু

শয্যায় থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন এবং তাঁর অনুলেখককে নির্দেশ দেন: লিখে রাখ। মৃত্যুর এই কঠিন মূহূর্তেও তিনি ইল্‌ম বিতরনে আগ্রহী ছিলেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি ইল্‌ম বিতরণে তিনি কতবেশী মুখলিস (একনিষ্ঠ) ছিলেন। তাঁর গোটা অন্তর ইল্‌মের মহব্বতে ভরপুর ছিল। ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন তখন ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি কিছুটা কাতরাচ্ছিলেন। তখন তাঁর জনৈক ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে সীরিনের সনদে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কাতরানোকে অপছন্দ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইমাম আহমাদকে আর কাতরাতে শুনা যায়নি। এই মনমানসিকতা যদি তালিবে ইল্‌মের মধ্যে থাকে তাহলে সে তালিবে ইল্‌ম ভবিষতে উম্মতের কল্যাণকামী আলেমে দ্বীন হতে পারবে- ইনশাআল্লাহ্। রাতদিন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে শুধু ইল্‌মকে ঘিরে। ছোটবড় সবার কাছ থেকে সে শিখবে। কোনো ইল্‌মকে সে তুচ্ছ মনে করবে না। কিছু মানুষ আছে এমন যখন তার চেয়ে কম মর্যাদার কেউ একজন কোনো একটি উপকারী বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায় তখন সে আত্মম্ভরিতা করে এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে না। এটি এ কারণে যে, সে ব্যক্তি নিজেকে ইল্‌মের চেয়ে বড় মনে করে। যে ব্যক্তি ইল্‌মের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে সে ইল্‌ম হাছিল করতে পারবে না। হতে পারে কম মর্যাদার কারো কাছে এমন একটি ইল্‌ম আছে বড় মর্যাদার কারো নিকট সে ইল্‌মটি নেই। হতে পারে কোনো একটি

ইল্‌ম ছোট্ট একজন তালিবে ইল্‌ম বুঝতে পেরেছে; অথচ বড় কোনো আলেম সে ইল্‌মটি বুঝতে পারেনি। ছোট্ট ছাত্রটি যখন সে জ্ঞানটি বুঝিয়ে বলে তখন বড় আলেমেরও বুঝে আসে। এ প্রসঙ্গে আলেমগণ সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে হুদহুদ পাখির ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। হুদহুদ পাখির মর্যাদাগত ও সৃষ্টিগত অবস্থান নিম্ন পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও এবং নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের মর্যাদা অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সুলাইমান আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে হুদহুদ পাখি বলে:

﴿فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ وَجِئۡتُكَ مِن سَبَإِۭ بِنَبَإٖ يَقِينٍ ٢٢﴾ [النمل: ٢٢]

“অতঃপর হুদহুদ এসে বলল: আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।” [সূরা নমল, আয়াত ২৭:২২] হুদহুদ পাখি যা জেনেছে সুলাইমান আলাইহিস সালাম তা জানতেন না। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আলেমগণ বলেন: ছোট হোক, বড় হোক যে ব্যক্তি তোমার নিকট কোন জ্ঞান নিয়ে আসবে তার সাথে আত্মম্ভরিতা করবে না। যে ব্যক্তি জ্ঞান নিয়ে এসেছে তুমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুন। কারণ হতে পারে সে তোমার জন্য নতুন কোন জ্ঞানের ফটক উন্মুক্ত করে দিবে।

এই তিনটি তালিবে ইল্‌মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ রকম আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা বলেছি আপনি সেগুলো এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী থেকে জেনে নিতে পারবেন।

এখন আসি এই প্রশ্নের জবাবে ইল্‌ম কিভাবে কোমলতা ও ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব? ইল্‌ম অর্জনের ক্রমধারা কি? অথবা ইল্‌ম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

জবাব: ইল্‌মে দ্বীন বা দ্বীনের জ্ঞান নানা প্রকার। এর মধ্যে কিছু হচ্ছে- মৌলিক ইল্‌ম (উলুম আসলিয়্যাহ্‌)। আর কিছু হচ্ছে সহায়ক ইল্‌ম (উলুম মুসায়িদা)। কেউ কেউ সহায়ক ইল্‌মগুলোকে মাধ্যম ইল্‌ম (উলুমুল আলা) বলেন। আবার কেউ কেউ শাস্ত্রিক ইল্‌ম (উলুম সিনাইয়্যা) বলেন।

মৌলিক ইল্‌ম হচ্ছে- কুরআন ও সুন্নাহর ইল্‌ম তথা ইলমুত তাফসির (তাফসিরবিদ্যা), ইলমুল হাদিস (হাদিসবিদ্যা), ইলমুল ফিক্‌হ (ইসলামি আইনশাস্ত্র)। এর পর ইলমুত্‌ তাওহিদ (আল্লাহর একত্বের বিদ্যা); যাকে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ইল্‌ম থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করে থাকি এই ইল্‌মের মহান মর্যাদার কারণে। যদিও সবগুলো ইল্‌মই কুরআন ও সুন্নাহ হতে উৎসারিত।
সুতরাং আমাদের নিকট মৌলিক ইল্‌ম হচ্ছে- তাফসির, তাওহিদ, হাদিস, ফিকহ। আর সহায়ক ইল্‌ম হচ্ছে- উসুলুত্‌ তাফসির (তাফসির তত্ত্ব) বা কারো কারো পরিভাষা অনুযায়ী উলুমুল কুরআন (Quranic Sciences), উসুলুল্‌ হাদিস (হাদিস তত্ত্ব) বা কারো কারো মতানুযায়ী মুস্‌ত্বালাহুল হাদিস (হাদিসের পরিভাষা), উসুলুল্‌ ফিক্‌হ (ইসলামি আইনের মূলনীতি), নাহু (আরবী ব্যাকরণ) ও আরবী ভাষাজ্ঞানসমূহ।

এই ইল্‌মগুলোকে অন্যভাবেও বিভাজন করা হয়। মৌলিক ইল্‌ম (উসুল) ও বিনোদনমূলক ইল্‌ম (মুলাহ)। মৌলিক ইল্‌মের মধ্যে রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত মৌলিক ইল্‌ম ও সহায়ক ইল্‌মের সবগুলো। আর বিনোদনমূলক ইল্‌ম হচ্ছে- সংবাদমূলক জ্ঞান, জীবনচরিত, বিরল ঘটনাবলী, কিস্‌সা-কাহিনী, ইতিহাস ইত্যাদি।

প্রথম: ইলমুত্‌ তাফসির

ইলমুত্‌ তাফসির এর ক্ষেত্রে ক্রমধারা অবলম্বন হলো- প্রথমে সংক্ষিপ্ত একটি তাফসিরগ্রন্থ দিয়ে আপনার অধ্যয়ন শুরু হবে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আপনি শুধুমাত্র আল্লাহর কালামের অর্থ জানার চেষ্টা করবেন। বিশেষতঃ আপনি যদি হাফেযে কুরআন হন তাহলে সংক্ষিপ্ত একটি তাফসির পড়া আপনার জন্য সবচেয়ে উপকারী। এ পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য আলেমগণ তাফসিরে জালালাইনকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। নিঃসন্দেহে তাফসিরে জালালাইন খুব উপদায়ক। কিন্তু এ কিতাব পড়ার সময় আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ এর মধ্যে বেশ কিছু অপব্যাখ্যা রয়েছে। এই কিতাবটি রচনা করেছেন জালালুদ্দিন মাহাল্লি ও জালালুদ্দিন সুয়ুতি। মুফাস্‌সাল শ্রেণীর সূরাগুলো (সূরা ক্বাফ-সূরা নাস) থেকে আপনি পড়া শুরু করবেন। যেহেতু এই সূরাগুলো প্রায়শঃ নামাযে শুনে থাকেন। সূরার অর্থ সংক্ষেপে বুঝে নিবেন। পুরো গ্রন্থটি মাত্র ছোট্ট দুটি খণ্ড। আপনি পঞ্চাশ পৃষ্ঠা শেষ করার পর আপনার গোটা মুফাস্‌সাল শ্রেণীর সূরাগুলোর অর্থ জানা হয়ে গেল। তখন নামাযে তিলাওয়াত শুনলে

আপনি অর্থ বুঝতে পারবেন। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ইল্‌ম আপনার হাসিল হয়ে গেলো।

প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনি তাফসীর বুঝেছেন যাতে করে অন্য বিদ্যার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন?

জবাব: আপনি নিজে নিজে তাফসির করতে পারেন কিনা সেটা যাচাই করবেন। উদাহরণতঃ আপনি সূরা 'ওয়াস শামসি ওয়া দুহাহা' পড়েছেন। তাফসিরে জালালাইনে সূরাটির তাফসির পড়েছেন এবং বুঝেছেন। কিন্তু কিভাবে বুঝবেন আপনি এই সূরার তাফসির আয়ত্ব করতে পেরেছেন কিনা? জালালাইন কিতাবটি বন্ধ করে নিজে নিজে তাফসির করা শুরু করুন। যদি আপনি নির্দ্বিধায় সঠিকভাবে সূরাটির তাফসির করতে সক্ষম হন তাহলে আপনি ক্রমধারা অনুসরণ করেছেন এবং আপনার তাফসির শেখা হয়েছে। এরপর আপনি নতুন পড়া শুরু করতে পারেন। এই পদ্ধতির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্য ইল্‌মের আলোচনাতেও আসবে। তাহলে আপনি শুরু করবেন তাফসিরে জালালাইন দিয়ে। পরবর্তী ধাপে আপনি জালালাইন এর চেয়ে বড় কোনো তাফসিরের কিতাব পড়বেন। যেমন শাইখ আব্দুর রহমান সা'দীর তাফসির অথবা তাফসিরে বাগাভি অথবা ইবনে কাসির অথবা ইবনে কাসিরের কোন একটি সংক্ষিপ্তসার (যদি বিপরীতমূখিতা ব্যতিরেকে কোনো সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়)। আপনি এ কিতাবটি কিছুটা দ্রুত পড়বেন। আপনি এই কিতাবটি পড়ে আল্লাহর কালামের মর্মার্থ জানবেন। এই গ্রন্থটিতে তথ্যের সমাহার জালালাইন এর চেয়ে বেশী ঘটবে। জালালাইনে যে তথ্যগুলো আপনি

অনুধাবন করতে পেরেছেন সেগুলো পুনরায় যখন আপনি পড়বেন তখন এ অতিরিক্ত তথ্যের সাথে পূর্বের পড়া তথ্যগুলো আপনার নিকট আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেহেতু আপনি নিজ থেকেই 'ওয়াস শামসি ওয়াদুহাহা' সূরাটি তাফসির করতে পেরেছেন। যখন আপনি তাফসিরে ইবনে কাসির পড়বেন অথবা তাফসিরে বাগাভি পড়বেন অথবা এ পর্যায়ের অন্য কোনো কিতাব পড়বেন তখন আপনি অনুভব করবেন যে, আপনি নতুন কিছু শিখতে পারছেন। এভাবে সময়ের সাথে সাথে আপনি অনুভব করবেন যে, আল্লাহর কালাম অনুধাবন করার জ্ঞান আপনার অনেকটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়: ইল্‌মে তাওহিদ

তাওহিদ দুই প্রকার: সাধারণ আকিদা ও ইবাদতঘনিষ্ঠ তাওহিদ। অর্থাৎ আল্লাহ চাহেত যে ইল্‌মে তাওহিদ আপনি পড়বেন সেই ইল্‌মের গ্রন্থগুলো দুই প্রকারের। এক প্রকারের কিতাবগুলোতে পাবেন সাধারণ আকিদা। এই প্রকারের কিতাব হচ্ছে যেমন- লুম'আতুল ইতিকাদ, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এর আল-ওয়াসিতিয়্যা, আল-'আকিদা আত্‌তাহাবিয়্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কিতাবগুলোতে আকিদার সবগুলো বিষয় উল্লেখ থাকে। যেমন- আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতিপালকত্বে ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, রাসূলগণের প্রতি ঈমান, শেষদিবসের প্রতি ঈমান, কিয়ামতের বিভীষিকার প্রতি ঈমান, কবরের আযাবের প্রতি ঈমান, পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান, কিয়ামতের পূর্বে যা ঘটবে

সেগুলোর প্রতি ঈমান, জান্নাত জাহান্নামের প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান, তাকদীরের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলীর প্রতি ঈমান। এ ধরনের গ্রন্থপ্রণেতাগণ এ বিষয়গুলোর পর আকিদার অন্য বিষয়গুলো পেশ করেন। যেমন- আল্লাহর ওলিগণ ও তাদের কারামত, সাহাবীগণ, ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান ও তার অধিকার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, সৎচরিত্র (যেমন ইবনে তাইমিয়া ওয়াসেতিয়ার শেষে উল্লেখ করেছেন) ইত্যাদি। এ ধরনের গ্রন্থ হলো সাধারণ আকিদার কিতাব।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রেও আপনি ক্রমধারা অবলম্বন করবেন। প্রথমে সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা কোনো একজন শাইখের নিকট পড়বেন। তাফসির পড়ার জন্য কোনো শাইখের প্রয়োজন নেই। তাফসিরের কোন বিষয় না বুঝলে যে কোন আলেমকে আপনি জিজ্ঞেস করে নিতে পারবেন। কিন্তু তাওহিদ অবশ্যই একজন শাইখের নিকট পড়তে হবে। যেমন ধরুন আপনি লুম‘আতুল ই‘তিকাদ দিয়ে শুরু করলেন। এ পুস্তিকাটি যদি মুখস্থ করে ফেলেন তাহলে খুব ভাল। আর মুখস্থ করতে না পারলে বারবার পড়বেন। যাতে করে এর অধ্যায়গুলো আপনার আয়ত্বে থাকে।

এ ক্ষেত্রে তালিবে ইল্‌মের ত্রুটি হলো তারা কোনো একটি কিতাব শাইখের নিকট পড়েন কিন্তু এই কিতাবের অধ্যায়গুলো, পরিচ্ছেদগুলো একবার উল্টিয়ে দেখেন না। শিক্ষক যে স্থানটি পড়ান

তিনি শুধু সে শিরোনামটিই জানেন- এটি ভুল। বরঞ্চ আপনার উচিত কিতাবের পরিচ্ছেদগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া।

আপনি লুম'আতুল ই'তিকাদ কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটুকু পড়বেন। এতে করে এ পুস্তিকার নিয়ম ও বিষয়বস্তু ইত্যাদি আপনার জানা হয়ে যাবে। তারপর শাইখ বা শিক্ষকের কাছে কিতাবটি পড়বেন।

লুম'আতুল ই'তিকাদ কিতাবটি প্রাথমিক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যার বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত। শাইখ বা শিক্ষক যখন তার কোনো ব্যাখ্যা করবেন তখন আপনি নীতিমালাগুলো লিখে রাখবেন। পরবর্তীতে আপনি এগুলো মুখস্থ করে নিবেন। যখন আপনি এই কিতাবের ব্যাখ্যাটি যথাযথভাবে আয়ত্ব করতে পারলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, কিতাবটি আপনি বুঝতে পেরেছেন এবং ভালভাবে আয়ত্ব আনতে পেরেছেন অথবা অন্তত অধিকাংশ বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পেরেছেন তখন আপনি অন্য একটি কিতাব পড়া শুরু করবেন। যেমন ধরুন, 'ওয়াসেতিয়্যাহ' গ্রন্থটি শুরু করলেন। 'ওয়াসেতিয়্যাহ' গ্রন্থটিও আপনি কোনো একজন শাইখের নিকট পড়বেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, পঠিত পরিচ্ছেদটি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

কিছু কিছু ছাত্র আছে তারা অনেক পড়ে। কিন্তু যখন নিজে ব্যাখ্যা করতে আসে তখন তিনি অ-শরয়ি ভাষায় ব্যাখ্যা করেন অথবা ভুল

ব্যাখ্যা করেন। কারণ তিনি মূলতঃই ভুল বুঝেছেন। কারণ তিনি নিজেকে পরীক্ষা করেননি। আপনি যখন 'ওয়াসেতিয়্যাহ্' এর কোনো একটি পরিচ্ছেদ ব্যাখ্যাসহ পড়া শেষ করবেন তখন আপনি নিজে নিজে ব্যাখ্যা করবেন। যেমন ধরুন, 'ওয়াসেতিয়্যা'র শুরুতে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ বলছেন: এটি হচ্ছে- নাজাতপ্রাপ্ত দল তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকিদা। আপনি যখন কিতাবটি ব্যাখ্যা করা শুরু করবেন তখন প্রথমে নাজাতপ্রাপ্ত দল কারা?- তার ব্যাখ্যা করবেন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত কারা?- তার ব্যাখ্যা করবেন? এভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি এ কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পেরেছেন।

বইয়ের মূল পাঠের মধ্যে যদি আল্লাহর সিফাতের (আল্লাহ গুণের) উল্লেখ আসে তখন আপনি সিফাতের ব্যাখ্যা করবেন। যেমন ধরুন, اَلْعُلُوُّ لِلّٰه (আল্লাহ্‌র জন্য সুউচ্চ স্থান সাব্যস্ত করার) গুণ এর ব্যাখ্যা করবেন। اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (আল্লাহ্‌র আরশের উপর উঠা) গুণ এর ব্যাখ্যা করবেন। ব্যাখ্যাকার যে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন যা আপনি পড়েছেন অথবা শুনেছেন সে সে বিষয়গুলো আপনি উল্লেখ করবেন। আপনি যদি বলেন যে, আমি ওয়াসিতিয়্যা পড়েছি। শুধু পড়া দ্বারা আপনার ইল্‌ম হাছিল হবে না। আপনাকে পড়াতে পারতে হবে। এটাকে আলেমসমাজ মু'আরাদাতুল ইল্‌ম (مُعَارَضَةُ الْعِلْمِ) বা মুদারাসাতুল ইল্‌ম (مُدَارَسَةُ الْعِلْمِ) বা মুযাকারাতুল ইল্‌ম (مُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ) তথা পুনঃপাঠ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ পুনঃপাঠকে আলেমগণ তিনটি নামে অভিহিত করেন- মু'আরাদাহ (مُعَارَضَةٌ),

মুদারাসা (مُدَارَسَةٌ), মুযাকারা (مُذَاكَرَةٌ)। হাদিসবিশারদগণ এ ক্ষেত্রে মুযাকারা শব্দটি ব্যবহার করেন। বলা হয়ে থাকে- ذَاكَرْتُ كَذَا (আমি অমুক হাদিসটি পুনর্বার পড়েছি)। ইমাম আহমাদ সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ইমাম আহমাদ ও প্রসিদ্ধ ইমাম আবু যুর'আ উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল কারীম আর্‌রাযী এশার সালাত একত্রে আদায় করতেন। তারপর তাঁরা ঘরে ফিরে দুইজনে মিলে পুনঃপাঠ শুরু করতেন। এভাবে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। ফজরের আযান শুনে তাঁরা সম্বিত ফিরে পেতেন। তাঁরা সারারাত জেগে পুনঃপাঠ চালিয়ে যেতেন। কিন্তু তাদের পুনঃপাঠের পদ্ধতিটি কি ছিল?

একজন হাদিসের সনদ উল্লেখ করতেন, অপরজন মতন উল্লেখ করতেন। আবার একজন মতন উল্লেখ করতেন, অপরজন সনদ উল্লেখ করতেন। এভাবে ইল্‌মকে পাকাপোক্ত করতেন।

আপনি শুধু কোনো শাইখ বা শিক্ষকের দার্‌সে হাযির হয়ে আলোচনা শুনলেন আর বাসায় চলে গেলেন, আপনার সর্বশেষ কাজ হচ্ছে কেবল শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা, (শোনার পর পুনঃপাঠ হয়নি) তাহলে আপনার ইল্‌ম হাসিল হবে না। দার্‌স শুনে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন বটে, সওয়াবও পাবেন -ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আপনার ইল্‌ম বাড়বে না। ইল্‌মের ভিত্তি গড়বে না। আপনি আলোচনা শুনার পর, ব্যাখ্যা পড়ে বুঝার পর নিজে নিজে ব্যাখ্যা করবেন। বুঝতে পারার লক্ষণ হলো- কিতাব বন্ধ করে নিজে নিজে ব্যাখ্যা করতে পারা, মাসআলাগুলো বিশ্লেষণ করতে পারা। আপনি যদি শতভাগ বুঝে থাকেন তাহলে আপনি প্রতিটি মাসআলা বিশ্লেষণ করতে

পারবেন। আপনার বুঝার মধ্যে কোনো প্রকার জড়তা থাকবে না। যদি আপনার বুঝের মধ্যে কমতি থাকে অথবা জড়তা থাকে অথবা আপনি বিকৃতভাবে বুঝে থাকেন তাহলে এ প্রধান গ্রন্থ্গুলো, যেগুলোকে মৌলিক গ্রন্থ্ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেগুলো ব্যাখ্যা করার তা আপনার কাছে ধরা পড়বে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে আপনি তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন। আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন, কিভাবে কথা বলবেন তা আপনি বুঝতে পারছেন না। মাসআলাগুলো একটির সাথে অপরটি পেঁচিয়ে ফেলছেন। অথচ যখন আপনি ব্যাখ্যা পড়েছেন তখন ঠিকই বুঝেছেন। পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ সম্মানিত হয় অথবা লজ্জিত হয়। সুতরাং আপনি নিজেকে যাচাই করে নিন- আপনি কি বুঝেছেন, নাকি বুঝেননি। যখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনি কোনো একটি অংশ ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; অথবা কোনো একটি বাক্য ব্যাখ্যা করতে পারছেন না তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি এ অংশটি বুঝেননি। এ অংশটি আপনাকে পুনরায় পড়তে হবে। অতএব, এ অংশটি ভালভাবে না বুঝে আপনি পরবর্তী অংশ পড়তে যাবেন না।

আগেকার দিনে তালিবে ইল্‌ম কোনো একজন শাইখের নিকট ইল্‌ম শিখত। শাইখ তাদেরকে বিশেষ কোনো বিষয় পড়াতেন। তারা যখন রাতে বাড়িতে ফিরে আসতেন তখন বই বন্ধ করে এক সহপাঠী অন্য সহপাঠীর নিকট ব্যাখ্যা করতেন। আবার দ্বিতীয়জন প্রথম জনের নিকট ব্যাখ্যা করতেন। তালিবে ইল্‌মের একাধিক নয়; একজন সহপাঠী থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সহপাঠীর সাথে আপনি

দৈনন্দিন পাঠ পুনঃঅধ্যয়ন করবেন। আপনি আপনার সহপাঠীকে ব্যাখ্যা করে শোনাবেন এবং আপনার সহপাঠী আপনাকে ব্যাখ্যা করে শুনাবে। তার বুঝার মধ্যে কোনো ভুল থাকলে আপনি তা সংশোধন করে দিবেন। আপনার বুঝার মধ্যে কোনো ভুল থাকলে সে সংশোধন করে দিবে। এভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করবেন।

'ওয়াসেতিয়্যাহ' গ্রন্থটি শেষ করার পর শুরু হবে তৃতীয় স্তর। 'ওয়াসেতিয়্যাহ' বুঝার পর আপনি 'হামাবিয়া' কিতাব পড়া শুরু করবেন। যদি আপনি চান 'তাহাবিয়া'র ব্যাখ্যাগ্রন্থও শুরু করতে পারেন; তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। যদি আপনি ওয়াসেতিয়্যাহ্ ভালোভাবে বুঝে থাকেন তাহলে আপনি ইবনে তাইমিয়ার অন্যান্য গ্রন্থও বুঝতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ্ নিজে নিজে পড়েই বুঝতে পারবেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো- আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে তিনি ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া পড়া শুরু করে দেন অথচ তিনি আকিদা শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোও জানেন না। ক্লান্তশ্রান্ত, ঘুম ঘুমভাব, হাতে মাত্র ১০/১৫ মিনিট সময় আছে এমন অবস্থায় এসে তিনি বলেন- আস, আমরা ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া পড়ি। বই খুলেই পড়া শুরু করে দেন। এরপর কোনো একটি মাসআলা নিয়ে আলেমদের সাথে তর্ক বাঁধিয়ে দেয়, অথচ মূলতঃই তিনি মাসআলাটি বুঝেননি। এ শ্রেণীর তালিবে ইল্ম প্রচুর। আমরাও এ প্রকার তালিবে ইল্মের মুখোমুখি হয়েছি। সে এসে বলা শুরু করে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এটা এটা বলেছেন- অথচ আপনি যদি ইবনে তাইমিয়ার বইটি পড়ে দেখেন দেখবেন যে শাইখুল ইসলাম

এমন কথা বলেননি। কি কারণে এই তালিবে ইল্‌ম এই ভুল করেছে- এর প্রথম কারণ সে পড়ার জন্য তার উত্তম সময় ব্যয় করেনি। দ্বিতীয় কারণ হলো- সে এই মাসআলার মূলনীতিগুলো জানে না। অর্থাৎ এই মাসআলার মূলনীতিগুলো তার স্মৃতিতে মজবুত নয়। এ কারণে আলেমদের বক্তব্য বুঝার ক্ষমতা তার মধ্যে অতি দুর্বল। এর চেয়ে বড় ভুল পদ্ধতি হলো- কোনো একজন ছাত্র সে ওয়াসেতিয়্যা বা হামাবিয়্যা বা লুম'আতুল ই'তিকাদই ভালভাবে আয়ত্ব করতে পারেনি সে গিয়ে প্রাচীন আলেমগণের কিতাব পড়া শুরু করে দিল। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদের 'আস-সুন্নাহ' নামক কিতাব পড়া শুরু করে দিল। অথবা ইবনে মানদা এর 'আল-ঈমান' পড়া শুরু করে দিল। অথবা ইবনে খুযাইমার 'আত্‌তাওহিদ' পড়া শুরু করে দিল। অথবা ইবনে মানদা এর 'আত্‌তাওহিদ' পড়া শুরু করে দিল। অনুরূপ বড় বড় অন্যান্য আকিদার গ্রন্থ, যে গ্রন্থগুলো যথাযথভাবে বিন্যস্ত নয়; যেভাবে পরবর্তী আলেমগণের গ্রন্থগুলো সুবিন্যস্ত। কিন্তু আপনি যদি মূলনীতিগুলো জানার পর প্রাচীন আলেমগণের কিতাবগুলো পড়েন তাহলে আপনি যথাযথভাবে সে বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম হবেন; ইনশাআল্লাহ। যেহেতু প্রাচীন আলেমগণের বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে আপনি ইতোপূর্বে শিখে নেয়া মূলনীতিগুলোর সহযোগিতা নিতে পারবেন। আপনি তাঁদের বক্তব্যের মর্মার্থ, উদ্দেশ্য এবং এ বক্তব্যের মধ্যে কি অর্ন্তভুক্ত এবং কি অন্তর্ভুক্ত নয়, কি কি উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত এবং কি কি উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত নয় সবকিছু বুঝতে পারবেন। উদাহরণতঃ- লুম'আতুল ই'তিকাদ এর

শুরুতে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনার বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন: بِلَا كَيْفٍ وَلَا مَعْنىً (বাহ্যিক অর্থ- কোনো আকার ও অর্থ ব্যতিরেকে) এইটুকুর সত্যিকার অর্থ[1] যে তালিবে ইল্‌ম বুঝে না সে কি এর বাহ্যিক যে অর্থ সে বুঝেছে তাই বলে দেবে? কারণ এর সত্যিকারের অর্থ তো কেবল সত্যনিষ্ঠ প্রাচীন আলেমগণের কিতাব পড়লেই বুঝতে সক্ষম হবে। তারপর সে এটিকে আমাদের বড় বড় আলেমগণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে। কারণ তাদের কাছে এমন ইল্‌ম রয়েছে যে ইল্‌ম অন্যদের নিকট নেই। আর যদি স্বল্প সময়ের কারণে আপনি তাঁদের মজলিসে হাযির হতে না পারেন, তাহলে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে যারা তালিবে ইল্‌ম রয়েছে তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত হবেন এবং ইল্‌ম হাছিলের সর্বজনবিদিত শর্তগুলো মেনে তা অর্জন করবেন।

তিন: হাদিস

তালিবে ইল্‌ম হাদিসের ইল্‌ম হাসিলের শুরুতেই ইমাম নাওয়াওয়ীর ‘আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ মুখস্থ করবে। যদি আপনি

---

[1] এর সত্যিকার অর্থ তো এই যে, আল্লাহর নাম ও গুণগুলোর কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, যেমনিভাবে এমন অর্থও করা যাবে না যার মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের সাথে সামঞ্জস্য তৈরী হয়। বরং বলা হবে যে, এগুলোর অবশ্যই অর্থ রয়েছে যা আমাদের জানা তবে তা সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নয়, আবার এগুলোর সুনির্দিষ্ট ধরণও রয়েছে, তবে সেগুলোর ধরণ আমাদের জানা নেই। [সম্পাদক]

এখানে সমবেত উপস্থিতিকে জিজ্ঞেস করেন আপনারা কি আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ মুখস্থ করেছেন? জবাব আসবে: না। আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ মুখস্থ না করেই তারা বড় বড় কিতাব যেমন- নাইলুল আওতার, সুবুলুস্ সালাম, ফাতহুল বারী ইত্যাদি পড়া শুরু করে দেয়। অথচ আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ হচ্ছে মূলভিত্তি।

আপনারা আলেমগণের জীবনচরিত সম্পর্কিত কিতাবগুলো পড়ে দেখুন। দেখতে পাবেন কোনো একজন আলেমের জীবনীতে উল্লেখ করা হয়নি যে, তিনি বড় কোনো কিতাব পড়েছেন। যেমন ধরুন, গ্রন্থকার এ কথা লিখবেন না যে, তিনি ফাত্হুল বারী পড়েছেন; তিনি আল-মাজমু ইত্যাদি পড়েছেন। বরঞ্চ আপনি সেখানে পাবেন তিনি আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ মুখস্থ করেছেন, তিনি আল-মুলাহা ফিন্নাহু মুখস্থ করেছেন, তিনি আল-উমদা ফিল ফিকহ মুখস্থ করেছেন, তিনি উমদাতুল আহকাম মুখস্থ করেছেন এবং এ ধরনের অন্যান্য পুস্তিকা মুখস্থ করার কথা আপনি পাবেন। এর কারণ কি? এর কারণ দুটো:

এক. আপনাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া যে, এটাই হচ্ছে ইল্ম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি; অন্য কোনো পদ্ধতি নয়।

দুই. এই আলেমের মর্যাদা তুলে ধরা যে, তাঁর ইল্ম ছিল মৌলিক ও সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ভর। কারণ তিনি এ ছোট্ট ছোট্ট পুস্তিকা দিয়ে তাঁর ইল্মী জীবন শুরু করেছেন, এ গ্রন্থগুলো আত্মস্থ করেছেন এবং শাইখদের নিকট পড়েছেন।

আপনি এমন কোন কথা পাবেন না যে, অমুক আলেম ফাতহুল বারী পড়েছেন অথবা নাইলুল আওতার পড়েছেন এবং এ গ্রন্থগুলো পড়ার কারণে আলেমের প্রশংসাও করা হয় না। কারণ ছোট্ট ছোট্ট কিতাবগুলো আত্মস্থ করতে পারলে আপনি এ গ্রন্থগুলোর বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ বুঝতে পারবেন।

মোদ্দাকথা হলো- হাদিসের ক্ষেত্রে আপনি আল-আরবা'ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ মুখস্থ করার মাধ্যমে ইল্‌ম অর্জন শুরু করবেন। আপনি এ হাদিসগুলো মুখস্থ করে নিবেন এবং সবসময় আওড়াবেন। এ হাদিসগুলো সূরা ফাতিহার মতো মজবুতভাবে মুখস্থ করে নিবেন। প্রতি সপ্তাহে একবার খতম দিবেন। প্রতিবার সমাপ্ত করণের মাধ্যমে আপনার মুখস্থকৃত হাদিসগুলো আরো পরিস্কার হবে। এরপর আপনি আল-আরবা'ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ পুস্তিকার কোনো একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়বেন। যদি কোনো একজন শিক্ষকের নিকট পড়তে পারেন তাহলে আরো ভাল। যদি কোনো শাইখের নিকট পড়ার সুযোগ আপনার না-থাকে তাহলে কোনো একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিয়ে পড়বেন এবং ব্যাখ্যা নিজে আত্মস্থ করবেন। যদি কোনো প্রশ্ন জাগে তাহলে কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন।

আল-আরবা'ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ মুখস্থ করার পর আপনি এর প্রত্যেকটি হাদিসের ব্যাখ্যা পড়বেন। ইমাম নাওয়াওয়ীর নিজের লেখা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি পড়তে পারেন। কারণ এটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

এরচেয়ে একটু বড় হচ্ছে- ইবনে দাকীকিল ‘ঈদ এর লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো পড়বেন। সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে- হাফেয ইবনে রজব হাম্বলীর গ্রন্থ।

আপনি নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি পড়বেন। প্রথম হাদিস তথা নিয়্যতের হাদিসটির ব্যাখ্যা পড়ার পর আপনি কিতাবটি বন্ধ করে ব্যাখ্যা করা শুরু করবেন। এভাবে আপনি অল্পসময়ে ব্যাপক উপকৃত হবেন। যদি আপনি কোনো মসজিদে ওয়াজ করতে চান আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহর কোনো একটি হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে ওয়াজ করতে পারবেন। এভাবে আপনি হাদিসের ব্যাখ্যাকে আত্মস্থ করবেন। এটিই আপনার সম্বল।
কোনো মসজিদে যদি খোতবা দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং সেখানে কিছু তালিবে ইল্‌ম থাকার পরও প্রত্যেকে একজন অপরজনকে বলে- তুমি খোতবা দাও। অপরজন বলে: আমি খোতবা দিতে জানি না। তালিবে ইল্‌মের সম্বল তো সার্বক্ষণিক তার সাথে থাকবে। তালিবে ইল্‌মের ন্যূনতম সম্বল হচ্ছে- কিছু আয়াতে কারীমা তাফসিরসহ জানা থাকা। যেমন ধরুন- সূরাতুল আস্‌র তাফসিরসহ জানা থাকা, সূরাতুল ইখলাস তাফসিরসহ জানা থাকা ইত্যাদি। অথবা হাদিসের পুস্তিকা আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ ব্যাখ্যাসহ জানা থাকা।
মোটকথা হচ্ছে- তালিবে ইল্‌মের এমন কিছু মৌলিক ইল্‌ম থাকতে হবে যে ইল্‌মের উপর ভিত্তি করে সে সামনে এগোতে পারবে। তাই বলছি- আল-আরবা‘ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ ব্যাখ্যাসহ মুখস্থ করার

মাধ্যমে তালিবে ইল্‌ম ব্যাপক কল্যাণ দেখতে পাবে। কারণ এ পুস্তিকার হাদিসগুলো প্রচুর মাসআলাকে অর্ন্তভুক্ত করেছে। 'আল-আরবা'ঈন আন-নাওয়াওয়িয়্যাহ' এর পর তালিবে ইল্‌ম হাদিসের পুস্তিকা 'উমদাতুল আহকাম' পড়া শুরু করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে এসে তিনি 'বুলুগুল মারাম' পড়বেন। যদি কোনো তালিবে ইল্‌ম নিজের মধ্যে ব্যাপক স্পৃহা অনুভব করেন তাহলে তিনি বুলুগুল মারাম মুখস্থ করে নিতে পারেন। আর যদি 'বুলুগুল মারাম' মুখস্থ করার হিম্মত না থাকে তাহলে তিনি 'উমদাতুল আহকাম' মুখস্থ করতে পারেন। বুলুগুল মারামের পর এই পর্ব শেষ। এবার তিনি হাদিসের বড় বড় গ্রন্থগুলো পড়তে কোনো আপত্তি নেই। যেমন- সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি। কিন্তু ইতোপূর্বে উল্লেখিত মৌলিক ভিত্তি অর্জনের পূর্বে আপনি এ কিতাবগুলো পড়া শুরু করবেন না। কারণ এতে করে আপনি এমন কিছু হাদিসের মুখোমুখি হবেন যেগুলোর অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। কিছু হাদিস আপনার সামনে আসতে পারে বাহ্যত আপনার কাছে এগুলোকে স্ববিরোধী মনে হবে। হতে পারে এ সকল হাদিস হতে নির্ণীত মাসআলাগুলো আপনার নিকট কঠিন মনে হতে পারে।

চার: ফিকহ

ইবনে কুদামা রাহেমাহুল্লাহ এর 'উমদাতুল ফিকহ' দিয়ে আপনি ফিকহের ইল্‌ম অর্জন শুরু করবেন। সৌদি আরবের বাইরের কোনো দেশের তালিবে ইল্‌ম যে কোনো মাযহাবের ছোট্ট একটি ফিকহের পুস্তিকা দিয়ে ইল্‌ম অর্জন শুরু করবেন। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে

মতভেদ খুব কম। অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি- হাম্বলী মাযহাবের মাসআলাগুলোর মধ্যে মারজুহ তথা অনগ্রগণ্য মাসআলার সংখ্যা খুব কম। যেমন ধরুন 'যাদুল মুসতাকনি' এর মধ্যে অনগ্রগণ্য মাসআলার সংখ্যা খুব নগণ্য; এ কিতাবের অধিকাংশ মাসআলাই অগ্রগণ্য।

মোট কথা- আপনি ছোট্ট একটি পুস্তিকা দিয়ে যেমন ধরুন, উমদাতুল ফিকহ দিয়ে 'ফিকহ' শাস্ত্র পড়া শুরু করবেন। আপনি এ কিতাবটি পড়বেন এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের মাসআলাসমূহ আত্মস্থ করবেন। উদাহরণতঃ আপনি পানি অধ্যায় পড়বেন। শুরুতে একবার গোটা অধ্যায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিবেন। এই পড়ার মাধ্যমে আপনি এই অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলো, প্রকারভেদগুলো জানবেন। কোন বিষয় দিয়ে শুরু করা হয়েছে? কোন বিষয় দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের অধিভুক্ত মাসআলাগুলো কি কি তা জানবেন? এরপর আপনি একজন শাইখের নিকট বইটি পড়বেন। ফিকহ আপনাকে অবশ্যই একজন শিক্ষকের নিকট পড়তে হবে। যদি কোনো উস্তায না পান সেক্ষেত্রে নিজে নিজে পড়তে পারেন। নাকি আপনি বলবেন, আমার তো অনেক বড় পজিশন, লোকেরা আমাকে অনেক বড় জ্ঞানী মনে করে; কোনো শিক্ষকের নিকট পড়া আমার জন্য কঠিন। না, এ ধরনের মানসিকতা আপনাকে পরিহার করতে হবে। বরং আপনি শিক্ষকের নিকটই পড়বেন এবং কোনো প্রশ্ন জাগলে সাথে সাথে শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিবেন।

ফিকহ কিভাবে পড়বেন? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অনেকে আছেন যারা ফিকহ পড়েন; কিন্তু আসলে তারা ফিকহ পড়তে জানেন না। ফিকহ পড়ার পদ্ধতি ও তাওহিদ পড়ার পদ্ধতি এক নয়। তাওহিদের মাসআলাগুলো কল্পনা করা ও আয়ত্বে আনা সহজ। কারণ আল্লাহর সিফাত সম্পৃক্ত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে একদল আলেম সরাসরি এগুলোকে সাব্যস্ত করেছেন। আর একদল আলেম এগুলোকে তাবীল তথা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে অপব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- তারা اَلْعُلُوُّ তথা আল্লাহর সুউচ্চে অবস্থিত থাকাকে আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদা ও সুউচ্চ ক্ষমতা হওয়ার অর্থে তাবীল (ব্যাখ্যা) করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর اَلإِسْتِوَاء তথা আরশের উপরে উঠাকে একটা বিশেষ অর্থে তাবীল করেছেন ইত্যাদি। এই ধরনের মাসআলাগুলোর স্বরূপ বুঝা সহজ। কিন্তু ফিকহ এর মাসআলাগুলোর স্বরূপ সুস্পষ্ট নয়। ফিকহের মাসআলাগুলোর স্বরূপ বুঝা এজন্যই জরুরী যেন একটি মাসআলার সাথে অন্য একটি মাসআলা তালগোল পাকিয়ে না যায়। ফিকাহ্ পড়ার জন্য ধীরস্থির চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। এই ছোট্ট পুস্তিকাটি (উমদাতুল ফিকহ) পড়ার ক্ষেত্রে আপনার পদ্ধতি হবে- প্রশ্ন ও উত্তরধর্মী। যেমন ধরুন আপনি বলবেন- পানি তিন প্রকার। আপনি পুস্তিকাটির ব্যাখ্যাগ্রন্থকে লক্ষ্য করে বলবেন- পানি কয় প্রকার? ব্যাখ্যাগ্রন্থ আপনাকে উত্তরে বলবে- পানি তিন প্রকার: ১. পবিত্রকারী। আপনি প্রশ্ন করবেন পবিত্রকারী পানির সংজ্ঞা কি? যদি আপনি এভাবে প্রশ্ন করা শিখতে পারেন দেখতে পাবেন আপনার প্রশ্নের পরপরই ব্যাখ্যাগ্রন্থে জবাব পেয়ে

যাচ্ছেন। আপনি জানবেন, পবিত্রকারী পানি হচ্ছে- যে পানি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের উপর অটুট আছে। অন্য ভাষায়- যে পানি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী। এইতো দেখতে পেলেন- আপনি প্রশ্ন করছেন; আর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। আপনি ফিকহের কিতাব এভাবে পড়বেন যেন ফিকহের কিতাব হচ্ছে- শিক্ষক। সে শিক্ষককে আপনি প্রশ্ন করছেন, আর কিতাব উত্তর দিচ্ছে। যখন এমন কোনো মাসআলা আসে যাতে কোনো শর্ত যোগ করা অথবা কোনো কিছু বাদ দেওয়ার বিষয় থাকে আপনি সে বিষয়ে উপযুক্ত কোনো প্রশ্ন করবেন। উদাহরণতঃ যদি বলা হয়- যে পানি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের উপর অটুট আছে। আপনি প্রশ্ন করবেন- এটা কি সাধারণভাবে সব পানি? তখন কিতাব আপনাকে কিছু অবস্থার কথা উল্লেখ করবে। এই পানির সাথে কি অন্য দ্রবণ মিশ্রিত হয়েছে কিনা? অথবা দ্রবণীয় নয় এমন কিছু মিশ্রিত হয়েছে কিনা....? আপনি প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকারভেদ করবেন।

বস্তুত: ফিকহের ইল্‌ম অর্জিত হয়- দু'টি মাধ্যমে:

এক- মাসআলাটির সঠিকরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হওয়া।

দুই- সঠিকভাবে বিভাজন করতে পারা।

ফিকহের সবচেয়ে উপকারী বিষয় হচ্ছে- প্রকারভেদকরণ। আপনি বলবেন- এটি এত এত ভাগে বিভক্ত। উদাহরণতঃ আপনি বলবেন- মৌলিক পানির সাথে মিশ্রণযোগ্য দ্রবণ দুই প্রকার। দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয়। এরপর দ্রবণীয় এর উদাহরণ পেশ করবেন। অদ্রবণীয়

এর উদাহরণ পেশ করবেন। ইবনে কুদামা তার উমদা কিতাবে এভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন। আপনি ফিকহের ক্লাশে অগ্রগণ্য মত কোনটি, দলীল কি সেটা জানার ওপর বেশী গুরুত্ব দিবেন না। কারণ এখনো আপনি ছাত্র; আপনি মুফতি নন। ফিকহের ক্লাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মাসআলাটির স্বরূপ প্রকৃতি আপনাকে বুঝানো এবং আলেমদের প্রকাশভঙ্গির সাথে আপনাকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। উদাহরণতঃ 'মুখতাসারুয যাদ'; আপনারা জানেন 'যাদ' কিতাবটি খুব ছোট। কিন্তু এই কিতাবে ত্রিশ হাজার মাসআলা আছে। ত্রিশ হাজার মাসআলা দলীলসহ, অগ্রগণ্য মত ও অনগ্রগণ্য মতসহ পড়া কি সম্ভব!! হয়তোবা শুধু পড়ে যাওয়া সম্ভব; কিন্তু 'যাদ' কিতাব বুঝা আর হবে না। এ কারণে 'যাদ' কিতাবের ব্যাখ্যা শেষ করেছেন এমন আলেমের সংখ্যা নগন্য। কারণ পূর্ববর্তী আলেমগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, যে পদ্ধতি তালিবে ইল্‌মের জন্য হিতকর এবং যে পদ্ধতিতে আলেম তৈরী হয়েছে সে পদ্ধতি বর্তমানে অনুপস্থিত। নানারকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এক মাসআলা নিয়েই আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যায়। কিন্তু তালিবে ইল্‌মের এত বিশ্লেষণ জানার প্রয়োজন নেই। তালিবে ইল্‌ম শুধু মাসআলাটির স্বরূপ জানবে এবং কিতাবটি যে মাযহাবের সে মাযহাবের অভিমতটি জানবে। পানির প্রথম প্রকার পড়া শেষ করার পর কিতাব বন্ধ করে ইতোপূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে আপনি পুনঃপাঠ শুরু করবেন এবং নিজে নিজে ব্যাখ্যা করবেন। যদি আপনার বুঝার মধ্যে কোনো গরমিল থাকে, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একবার আপনি পূবে চলে যাবেন, একবার পশ্চিমে চলে আসবেন।

আপনার নিজের কাছেই সেটা ধরা পড়বে। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান কতই না বড়। কবি বলেছেন-

سارتْ مشرِّقةً وسرتَ مغرِّبًا :: شتَّان بين مشرِّق ومغرِّب

সে গিয়েছে পূর্ব দিগন্তে, আর তুমি চলছ পশ্চিম দিগন্তে। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান কতই না সুদীর্ঘ!

যদি অবস্থা এমন হয় (যেমনটি বর্ণিত হলো) তাহলে পরিচ্ছেদটি আপনি পুনরায় পড়বেন। আপনার শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করে বুঝে নিবেন। আপনাকে যে শিক্ষক পড়ান তিনি যদি রব্বানী (পাইলটের মতো আলেম) হন তাহলে যে সকল মাসআলাতে আলেমগণের ফতোয়া এই কিতাবের মতের বিপরীত রয়েছে তিনি তা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন: এটি এই গ্রন্থকারের অভিমত; কিন্তু আলেমদের ফতোয়া এর বিপরীত বা অগ্রগণ্য মত হচ্ছে- এই। প্রত্যেকটি মাসআলাতে শিক্ষকের নিকট অগ্রগণ্য মত কোনটি সেটি উল্লেখ করতে হবে- এমনটি নয়। আর অগ্রগণ্য মত বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- বড় বড় আলেমে দ্বীন ও মুফতিগণের নিকট যেটি অগ্রগণ্য- সেই অভিমত। এভাবে শিক্ষক ফিকহের কিতাব ও ফতোয়ার সাথে আপনার সম্পর্ক তৈরী করে দিবেন। আপনার সাথে ফিকহের কিতাবের যেমন সম্পর্ক তৈরী হবে, তেমনি ফতোয়ার কিতাবের সাথেও সম্পর্ক তৈরী হবে। আমার শিক্ষকগণ 'যাদ' পাঠদানকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করতেন:

প্রথমত: গ্রন্থকারের ভাষ্যের আলোকে মাসআলার স্বরূপ ও বিধান উল্লেখ করতেন।

যদি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বা তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যেম অথবা দাওয়াহ-ইমামদের নির্বাচিত কোনো অভিমত থাকে তাহলে সেটি উল্লেখ করতেন। যেহেতু এ সকল আলেম হাম্বলী মাযহাবকে সমৃদ্ধ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের কোনো অভিমত যদি অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত হয় তাহলে তাঁরা তা উল্লেখ করতেন। উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি- পানি তিন প্রকার। শিক্ষক আপনাকে বলবেন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মতে পানি দুই প্রকার। প্রতিটি মাসআলাতে এর বেশী বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। শিক্ষকের মন্তব্যের দরকার নেই। শুধু এইটুকু বলবেন: এ বিষয়ে ফতোয়া হচ্ছে এই। অমুক শাইখ এই ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন- শাইখ আব্দুল আযিয ইবন বায এই মাসআলায় এই ফতোয়া দিয়েছেন। এভাবে শিক্ষক কিতাবের সাথে ও ফতোয়ার সাথে আপনাকে সম্পৃক্ত করবেন। কিন্তু প্রত্যেকটি মাসআলায় এসে এই মাসআলার দলীল হচ্ছে এটা। বিপক্ষীয় আলেমগণ এই দিয়ে দলীল দিয়েছেন। এই দলীলটি তথা হাদিসটি অমুক অমুক সংকলক সংকলন করেছেন। এই হাদিসের সনদে অমুক রাবী আছেন। সেই রাবী অমুক ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং এ হাদিস দিয়ে দলীল পেশ চলবে না। অতএব, এ মতটি অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত। সঠিক হচ্ছে- শা'বী, ইসহাক ও শাফেয়ীর অভিমত। সব মাসআলাতে তালিবে ইল্‌মের এতকিছু জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে তালিবে ইল্‌মের বিস্তারিত এ তথ্যগুলো হজম করার ক্ষমতা আছে সে বড় বড় কিতাবগুলো থেকে নিজে পড়ে নিবে। শিক্ষক পাঠপ্রস্তুতিকালে যে কয়টি কিতাব পড়েছেন বা

জেনেছেন এর সকল তথ্য ক্লাশে উল্লেখ করা জরুরী নয়। যদি তিনি সব তথ্য ক্লাশে উল্লেখ করেন এর মানে হচ্ছে- তিনি যা পড়েছেন তার সবটুকু ক্লাশে উগলে দিচ্ছেন। এটি আলেমগণের পদ্ধতি নয়। আলেমগণের পদ্ধতি হচ্ছে- যতটুকু দিলে তালিবে ইল্ম লাভবান হবে ততটুকু দেওয়া; এর বেশী নয়। ফিকহের সব অধ্যায়ের ব্যাপারে একই কথা প্রযোজ্য। পুস্তিকাটির প্রত্যেকটি অধ্যায় আপনি এ পদ্ধতিতে পড়বেন। আপনি যখন মাসআলাগুলোর স্বরূপ সঠিকভাবে আয়ত্ব করতে পারবেন তখন দেখবেন সময়ের সাথে আপনার মগজে ইল্মের একটি ভিত্তি তৈরী হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে আপনি রাজেহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) ও মারজুহ (অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত) অভিমতটি চিহ্নিত করতে পারছেন। অপ্রাধান্য মতের দলীলটির ক্রটি ধরতে পারছেন। এভাবে সময়ের সাথে আপনার জ্ঞানপ্রাসাদের প্রতিটি স্তম্ভ স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হবে। এভাবে আপনি জ্ঞানের প্রাসাদ তৈরী করবেন। প্রথমে ভিত্তি রচনা করবেন। তারপর ধীরে ধীরে আপনার জ্ঞানের প্রাসাদ উঁচু হতে থাকবে এবং আপনি মাসআলাগুলোর স্বরূপ বুঝতে থাকবেন। যেমন ধরুন প্রথম দিকে আপনি ১০% মাসআলার স্বরূপ ও দলীল বুঝতে পারবেন। একবছর পর আপনি অনুভব করবেন ১৫% মাসআলা বুঝতে পারছেন। দুইবছর পর আপনি ২০% মাসআলা বুঝতে পারছেন। এভাবে সময়ের সাথে সাথে আপনার ইল্মের ইমারত উন্নীত হবে। কিন্তু বর্তমানে যে পদ্ধতি চালু আছে এতে দেখা যায় তালিবে ইল্ম এক মাসআলার খুঁটিনাটি সবকিছু জানে। কিন্তু ফিকহের অন্য একটি মাসআলা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এটি

ইল্‌মে দ্বীন হাছিলের ত্রুটি। এতে ফিকহের সবগুলো বিষয় তালিবে ইল্‌মের আয়ত্বে আসছে না। পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে আপনি আপনার ইল্‌ম বৃদ্ধি করতে থাকবেন।

সহায়ক ইল্‌মগুলোর ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আমরা মৌলিক ইল্‌মগুলোর আলোচনা শেষ করেছি। সহায়ক ইল্‌মগুলোর ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতিতে ইল্‌ম হাছিল করবেন। প্রথমে ছোট্ট ছোট্ট মতন (মুখস্থযোগ্য পুস্তিকা) দিয়ে ইল্‌ম হাছিল শুরু করবেন। ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হবেন। ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, ইতিহাস ইল্‌মের একটি শাখা। এর অধীনে রয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিরাত (জীবনচরিত)। সিরাত জানার জন্য 'সিরাতে ইবনে হিশাম' যথেষ্ট। ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু বিদ্যা রয়েছে। এ শ্রেণীর ইল্‌মকে বলা হয় ইল্‌মুল মুলাহ (বিনোদনমূলক জ্ঞান)। এ শ্রেণীর ইল্‌ম আপনি যতটুকু ইচ্ছা হাছিল করতে পারেন। কিছু ইল্‌মকে আপনি খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন- উসুলুত তাফসির (তাফসির তত্ত্ব), উসুলুল ফিকহ (ইসলামী আইন তত্ত্ব), উসুলুল হাদিস (হাদিস তত্ত্ব) বা মুসতালাহুল হাদিস (হাদিসের পরিভাষা), নাহু (আরবী ব্যাকরণ)। নাহু ছাড়া কোনো ইল্‌ম নেই। কবি ইবনুল ওয়ারদি বলেন:

جَمِّلِ المَنْطِقَ بِالنَّحْوِ فَمَنْ يُحْرَمُ الإِعْرَابَ بِالنُّطْقِ اخْتَبَل

'নাহুর মাধ্যমে তোমার ভাষাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কর,
যার কথাবার্তায় ইরাব (শব্দের শেষ হরকত) ঠিক থাকে না সেতো বিকারগ্রস্ত'

আজকাল এমন তালিবে ইল্‌ম পাওয়া যায় যারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে কথা বলে। যে তালিবে ইল্‌ম নাহু জানে না সে কিতাব ও সুন্নাহ বুঝবে এই নিরাপত্তা কি আপনি দিতে পারেন? বাস্তব ক্ষেত্রে এতটুকু বলা যায় সে মুকাল্লিদ হতে পারবে অর্থাৎ আলেমদের বক্তব্য প্রচার করতে পারবে। যে ছাত্র আরবীতে দুর্বল সে কোনো মাসআলায় নিজে নিজে সিদ্ধান্ত দিবে আপনি এমন কোনো নজির দেখাতে পারবেন না। আরবী ভাষা না জানাটা বড় ধরনের ত্রুটি। অতএব, নাহুর উপর খুব গুরুত্ব দিতে হবে। নাহুর মূলপাঠ হচ্ছে- ই‘রাব (শব্দের শেষ হরফের হরকত কি তা জানা)। একজন শাইখের নিকট আপনি ইরাব পড়বেন। তারপর আপনার সামনে আরবীতে লেখা যা কিছু পান সেটা ই‘রাব করবেন। এমনকি পত্রিকা পড়লে পত্রিকার বাক্যগুলোরও ই‘রাব করবেন। কোন একটি সূরা পড়লে সেটাও ই‘রাব করবেন। হাদিস পড়লে হাদিসও ই‘রাব করবেন। এর মাধ্যমে আপনার নাহুর অবস্থা কি তা আপনি বুঝতে পারবেন। যদি আপনার নাহুর জ্ঞান দুর্বল হয় তাহলে এখনি আপনি নাহু পড়া শুরু করুন। বড় বড় আলেমদের মজলিসে ই‘রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হত। যে আলেমগণ বিভিন্ন মজলিসে ইল্‌ম শিক্ষা দেন তাদের মজলিসে অবশ্যই নাহুর আলোচনা ও অন্যান্য সহায়ক ইল্‌মের আলোচনা থাকতে হবে। শাইখকে জিজ্ঞেস করতে হবে- আল্লাহ তা‘আলার অমুক বাণীর ই‘রাব কি? অমুক বাক্যের ই‘রাব কি? ই‘রাব জানার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। তালিবে ইল্‌মের নাহুর জ্ঞান যদি আরেকটু উন্নত হয় এবং সে ‘আলফিয়াতু ইবনে মালেক’ মুখস্থ করে

নিতে পারে তাহলে সে ই'রাবও উল্লেখ করবে এবং দলীলও উল্লেখ করবে। উদাহরণতঃ ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হবে مُحَمَّدٌ قَادِمٌ (মুহাম্মদ আগমনকারী) এখানে مُحَمَّدٌ এর ইরাব কি? ছাত্র বলবে: مُبْتَدَأٌ (উদ্দেশ্য)। শিক্ষক বলবেন: তুমি বলেছ مُبْتَدَأٌ (উদ্দেশ্য); এর দলীল কি? ছাত্র বলবে: ইবনে মালেক বলেছেন:

مُبْتَدَأٌ زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرٌ :: إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنْ اعْتَذَرَ

"তুমি যদি বল: زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنْ اعْتَذَرَ এই বাক্যে زَيْدٌ মুবতাদা (উদ্দেশ্য) এবং عَاذِرٌ খবর (বিধেয়)।

আরেকটি উদাহরণ- আপনি যদি পড়েন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾

(যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট)।[সূরা নাহল, আয়াত: ৬০] ছাত্র বলবে: الذين শব্দটি اسم موصول । اسم موصول এর অবশ্যই একটি صِلَةٌ থাকতে হয় এবং صِلَةٌ এর মধ্যে একটি عَائِدٌ (নির্দেশক সর্বনাম) থাকতে হয় যা اسم موصول কে নির্দেশ করে। শিক্ষক জিজ্ঞেস করবেন এই আয়াতে সে عَائِدٌ কোনটি? ছাত্র জবাব দিবে: সেটি বিলুপ্ত। শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: দলীল কি? ছাত্র জবাব দিবে: ইবনে মালেক বলেছেন-

....وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ......بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ

"......................বিলুপ্ত করণের প্রথা ভাষাভাষীদের নিকট প্রচুর। সংযুক্ত عَائِدٌ এর ক্ষেত্রে। যদি সে টি فِعْل (ক্রিয়া) দ্বারা

অথবা وَصْفٌ (বিশেষণীয় পদ) দ্বারা نَصَبٌ গ্রহণ করে থাকে। যেমন- مَنْ نَرْجُو يَهَبْ ।

এভাবে নাহুর সাথে দলীলও জানা হবে। কিন্তু এ পদ্ধতিটি বর্তমানে অনুপস্থিত। আমরা আজকের আলোচনা শেষ করব ইল্‌ম অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এবং সঠিক শিক্ষাক্রম অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে। আজ মুসলিম উম্মাহর আলেমে দ্বীনের বড় প্রয়োজন, তালিবে ইল্‌মের বড় প্রয়োজন যেন তাঁরা উম্মতকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। আজ যারা উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন নানারকম চিন্তাধারা, নানারকম কৃষ্টিকালচার ও নানারকম দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। ইল্‌মের আলোকে দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে কোথায়!! যে ইল্‌ম হবে সুদৃঢ়, দলীলনির্ভর, মূলনীতিনির্ভর, পূর্ববর্তী আলেমদের মতামতনির্ভর। যেন মানুষ সুস্পষ্ট পথে আগাতে পারে। আজ তালিবে ইল্‌মের বড় প্রয়োজন। ইল্‌মের আকাঙ্ক্ষী অনেক; কিন্তু তালিবে ইল্‌ম কম। কারা তালিবে ইল্‌ম? যারা ইল্‌ম অর্জনের সঠিক পথ অনুসরণ করেন। যে পথ আমাদের পূর্বসুরি আলেমগণ অনুসরণ করে গেছেন। আমি আজকের আলোচনায় আপনাদের নিকট সে পথ তুলে ধরেছি। যদি আপনি সে পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনি অনেক লাভবান হবেন। একবছরের মাথায় আপনি অনুভব করবেন আপনি নিজেকে অনেক পরিবর্তন করতে পেরেছেন। আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন আসলেই আপনি তালিবে ইল্‌ম। আপনি ইল্‌ম বুঝা শুরু করেছেন। আর যদি আপনি

অবহেলা করেন এবং শুধু দারসে আসা যাওয়া করেন, কিন্তু ইল্‌মের ভিত্তি রচনা না করেন তাহলে আপনার অবহেলা অনুপাতে আপনি ইল্‌ম হতে বঞ্চিত হবেন।

আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার কলব ও আপনাদের অন্তর হিদায়াতের নূর দিয়ে ভরপুর করে দেন। তিনি যেন আমাদেরকে তার আনুগত্যের ওপর অবিচলতা (ইস্তিকামত) দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তালিবে ইল্‌ম হিসেবে কবুল করেন, যারা তাঁকে ভয় করে। তিনি যেন আমাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়ে দেন যারা পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে মৃত আত্মাগুলোকে জীবিত করেন। আমাদের এই মজলিসে উপস্থিত সকলকে যেন আল্লাহ তা'আলা উত্তম মৃত্যু দান করেন। আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের জন্য কল্যাণপ্রাপ্তি সহজ করে দেন। এক মূহূর্তের জন্যেও তিনি যেন আমাদের জিম্মাদারি ছেড়ে না দেন। তিনি যে কথা ও কাজ পছন্দ করেন, ভালবাসেন আমাদেরকে যেন সেটা পালন করার সামর্থ্য দেন। তিনিই তো কর্মবিধায়ক এবং এর সাধ্য রাখেন।

﴿سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝١٨٠ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۝١٨١ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝١٨٢﴾ [الصافات: ١٨٠، ١٨٢]

(তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আপনার রব্ব, সম্মান ও শৌর্যবীর্যসম্পন্ন রব্ব, কতই না পবিত্র! আর রাসূলগণের প্রতি সালাম

বর্ষিত হোক। সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্য।) [সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ৩৭:১৮০-১৮২]